

লেখকের কথা

একটি রক্তাক্ত স্ক্রিন, অনবরত ভেসে আসা নোটিফিকেশন, কোনো শিশুর ছিন্নভিন্ন শরীর, কোনো মা ধ্বংসস্তুপের নিচে সন্তানের নাম ধরে ডাকছেন। কোনো বাবা শেষবারের মতো কপালে চুমু খাচ্ছেন তার শহীদ শিশুকে। কেউ ক্ষুধায় শুকিয়ে যাচ্ছে। কেউ পানির জন্য অপেক্ষা করতে করতে মৃত্যুর কাছে হার মানছে।

গত দুই বছর ধরে পৃথিবীর এক প্রান্ত যখন মহাকাশ জয়ের গল্প লিখছিল, ঠিক তখনই গাজার ধ্বংসস্তুপের নিচে দাঁড়িয়ে কেউ লিখছিল তার শেষ বিদায়বার্তা।

সংবাদমাধ্যমে তারা প্রায়ই কেবল ‘মৃতের সংখ্যা’ কিংবা ‘বাস্তুচ্যুত মানুষের পরিসংখ্যান’ হয়ে ওঠে। অথচ তারা কেউ শুধুমাত্র সংখ্যা ছিল না। তাদের প্রত্যেকের একটি নাম ছিল, একটি পরিবার ছিল, অসমাপ্ত কিছু স্বপ্ন ছিল। আমি পড়তাম।

পড়তে পড়তে বুকের ভেতরটা ভেঙে যেত। তারপর একদিন খেয়াল করলাম, আমার চারপাশের অনেক মানুষ কিছুই জানে না। জানে না—এমন নয়; ভাষা তাদের কাছে এক অদৃশ্য দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে হয়ত।

স্ক্রিনের ওপাশ থেকে গাজার মানুষদের আকুতি—

“আমাদের ভুলে যেয়ো না।” চুপ “করে থেকো না” আমাদের কথা বলতে থাকো যদি তুমি একজনও হও।”

সেদিন থেকে কিছু কিছু অনুবাদ করে ফেসবুকে পোস্ট করতে শুরু করি।

আফিফা আপু বললেন, তুমি এগুলো দিন তারিখ দিয়ে জার্নাল আকারে লিখে রাখতে পারো। আমি তা-ই করছিলাম। প্রতিদিন এত কিছু ঘটছিল সব পোস্ট করা হত না। জমা হতে লাগলো ডব্ল ফাইল। একদিন আফিফা আপু বললেন এগুলো বই করে ফেলো। ফেসবুক আজ আছে, কাল নেই; কিন্তু বই থেকে যায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এটুকু অস্তুত দলিল হয়ে থাকুক।”

যৌক্তিক কথা হলেও আমি কিছুতেই রাজি হচ্ছিলাম না। কারণ নিজেকে কোনোদিন লেখক বা সংকলক বলে ভাবিনি। শেষ পর্যন্ত তাঁর আন্তরিক অনুপ্রেরণার কাছে হার মানলাম।

‘গাজার দিনলিপি’ কোনো কল্পকাহিনি নয়। এটি গাজার সাধারণ মানুষ, সাংবাদিক, চিকিৎসাকর্মী, উদ্ধারকর্মী এবং যুদ্ধের প্রত্যক্ষ সাক্ষীদের সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত লেখা, স্মৃতি ও অনুভূতির বাংলা সংকলন। কোথাও অনুবাদ, কোথাও সংকলন, আর কোথাও প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা—তবে প্রতিটি লেখার কেন্দ্রে রয়েছে গাজার মানুষ।

এই বই যদি অন্তত একজন পাঠককেও ইতিহাসের এই রক্তাক্ত অধ্যায় ভুলে যেতে না দেয়—তাহলেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

কারণ গণহত্যার সবচেয়ে বড় সহযোগী শুধু অস্ত্র নয়, বিস্মৃতিও।

এই বই সেই বিস্মৃতির বিরুদ্ধে আমার ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য মাত্র।

নায়মা তামান্না

nayematamanna@gmail.com

সম্পাদকের কথা

অবশেষে।

নাঈমা তামান্নার সঙ্গে পরিচয়ের এক যুগ পরে তাঁর বই আনা গেল – এটা একই সঙ্গে দুঃখের ও আনন্দের সংবাদ। পরিচয়ের সূত্র কিছুটা লেখালেখির রেশ ধরেই; সেই সময়ের উদীয়মান লেখকদের অন্যতম ছিলেন তিনি। বেশ কিছু পত্রিকায় ভালো ভালো প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে নিজের অবস্থান তৈরি করার পরেও লেখাটা ধরে রাখেননি। না হলে ইসলামপ্রধান লেখিকাদের মধ্যে তাঁর নাম অনেক ওপরের দিকে থাকত এত দিনে।

সম্প্রতি ফিলিস্তিন সূত্রে ফেসবুকে নিয়মিত গাজাবিষয়ক সংবাদ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে মোটামুটি আবার লেখার সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়েছেন। তাঁর নিকটজন ও শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে ব্যাপারটা আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের। একই সঙ্গে বইটির সম্পাদনা করার সুযোগও পাওয়াটা সৌভাগ্যের। আমার আশা ও দোয়া – লেখার এই ধারা তিনি বজায় রাখবেন, বিশেষ করে ফিলিস্তিন নিয়ে তাঁর অনেক লেখা দরকার।

আমি সমালোচনায় দক্ষ হলেও সম্পাদনায় নতুন। দেড় লাখ শব্দের বিশাল ভাণ্ডার থেকে যথাসম্ভব প্রাসঙ্গিক ও দীর্ঘ আবেদনসম্পন্ন লেখা বাছাই করে বই-উপযোগী করার চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে সম্পাদনা প্রতিষ্ঠান ‘মাহারাত’-এর অবদানও উল্লেখযোগ্য।

তা সত্ত্বেও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। সমঝদার পাঠকের চোখে কোনো ভুল দেখা গেলে আমাদেরকে জানাবেন। আমি ইনশা আল্লাহ শুধরে নেব।

বইটির প্রকাশক আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন ছোট ভাই। এই বইয়ের মাধ্যমে সে তাঁর প্রকাশনার যাত্রা শুরু করল। এটাও আমার জন্য আনন্দের সংবাদ। বইয়ের যা কিছু ভালো, তা আল্লাহর তরফ থেকে। নাঈমার বাছাই করা লেখা ও আবিদের যত্নের প্রকাশনার পরে এতে যা কিছু ভুল, তার দায় সম্পাদকের। আল্লাহ এই বইয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করুন।

আফিফা মারজানা





পর্ব : এক

আকসার ফুল

“ফুল ফোটে ধ্বংসস্তূপেও— জীবন হার মানতে শেখেনি”



অনাথের আলিঙ্গন

হিবা—আমার বোন হানানের মেয়ে। আর শাম—শহীদ সাংবাদিক আনাস আল-শরীফের কন্যা। দুটি ছোট্ট মেয়ে, দুই বাবার শূন্যতা বুকে নিয়ে আজ প্রথমবার মুখোমুখি দাঁড়াল।

হিবার বাবা হাসান শহীদ হয়েছিলেন ২০২৩ সালের অক্টোবরে, যখন এই গণহত্যা সবে শুরু। হিবা ছিল বাবার পাগল। বাবা-অন্তঃপ্রাণ এই মেয়েটি কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি যে বাবা আর নেই। সে বাবার জানাজায় যেতে রাজি হয়নি, শেষ বিদায়ের মুহূর্তেও না। বাবাকে হারানোর পর থেকে ভেতরে ভেতরে জমেছে এক গভীর ক্ষত। আজও বাবার নাম শুনলে কান চেপে পালিয়ে যায়, ছবির দিকে তাকালে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে এই শোকের মুখোমুখি হতে ভয় পায়। চিৎকার করে বলে ওঠে—

“আমার বাবা নেই—এ কথা তোমরা বলো না, প্লিজ!”

আজ যখন আমি বললাম, আমি যাচ্ছি বায়ানের কাছে—আনাসের স্ত্রী—তাঁর খোঁজ নিতে, শাম আর সালাহর সঙ্গে একটু দেখা করতে—হিবা জেদ ধরে বসল, সে-ও যাবে। আমার হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রইল, যতক্ষণ না অনুমতি পেল। সে শামের সঙ্গে দেখা করবে।

অথচ এই দুটি ছোট্ট মেয়ে কোনোদিন একে অপরকে দেখেনি। শুধু নিষ্ঠুর ভাগ্য তাদের একই দুঃখে মিলিয়ে দিয়েছে। আমি তখনই বুঝেছিলাম—হিবা চায় তার মতো আরেক অনাথ শিশুকে সান্ত্বনা দিতে। হিবা জানে, বাবা না থাকার যন্ত্রণা কতটা ভারী। তাই সে শামের দুঃখের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিতে চায়।

আমরা যখন পৌঁছলাম, হিবা পকেট থেকে বের করল চারটি গোলাপি পুঁতির ব্রেসলেট। সে এগুলো নিজের হাতে বানিয়ে এনেছে শামের জন্য। এগিয়ে দিয়ে বলল:

“এগুলো তোমার জন্য এনেছি—এসো পরিয়ে দিই। তারপর চলো খেলি।”

শামকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল সে। দু’জন মিলে খেলল, হাসল, ছবি তুলল...আর আমি দূর থেকে তাকিয়ে রইলাম। মনে কেবল একটাই প্রশ্ন—

কীভাবে এত কোমল শৈশব এই কঠিন শব্দ “অনাথত্ব” বয়ে বেড়ায়? কীভাবে তাদের ছোট ছোট কাঁধে চাপানো হয় জীবনের এত করুণ অধ্যায়? কীভাবে তারা একে অপরের চোখের ভেতর দিয়ে বাবাদের অনুপস্থিতি ভাগ করে নেয়—কোনো শব্দ ছাড়াই?

কেমন সময় এলো—যেখানে শিশুরা আমাদের মতো বড়দের সান্ত্বনা দেয়, আমাদের

দুঃখ ভাগ করে নেয়?

আমিও তো এক এতিম। যদিও আমার বয়স শৈশবের সীমারেখা পেরিয়ে গেছে, তবু এখনো মায়ের অভাব আমাকে প্রতিনিয়ত তাড়া করে বেড়ায়। আমিও তাদের সঙ্গী, তাদের মতোই এতিম। শোকের করাল আঘাত আমার বুকেও দগদগে ক্ষত হয়ে আছে। রাত গভীর হলে এখনো আমি একাকী চিৎকার করে কাঁদি—

মা, ও মা, মা গো...

— হালা আল-বুস্তানেজ, জাবালিয়া, উত্তর গাজা, ২২ আগস্ট ২০২৫



শীতল হাওয়ার খোঁজে

আমির। পাঁচ বছর বয়স। ছোট হাতে শক্ত করে ধরা ছিল একটি হলুদ বেলুন। সেই বেলুনই হয়তো ছিল গাজার অপরূপ আকাশের নিচে তার একমাত্র উড়ান-স্বপ্ন।

আমিরের বাবা-মা শহীদ হয়েছেন গাজা শহরের পশ্চিমে অবস্থিত আল-মাজদা ওসিলা স্কুলে। গত শুক্রবার রাত নয়টায় ঘটেছে সেই হত্যাযজ্ঞ।

বাবা ইসমাইল আল-মিসরী (৩৯) এবং মা ফাতিমা স্কুলের আঙিনায় খাটানো তাঁবুর সামনে বসেছিলেন—প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচতে, একটু ঠান্ডা বাতাসের আশায়। ছোট আমির বসেছিল মায়ের কোলে, হলুদ বেলুনটা দু’হাতে আঁকড়ে। তার ভাই-বোনেরা ছিল তাঁবুর পেছনের দরজার কাছে; সেখানে হয়তো একটু বাতাস পাওয়া যাবে ভেবে।

কিন্তু হঠাৎই পাশের একটি তাঁবুতে ঘটল ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণ। সাতজন শহীদ হলেন, ত্রিশজন আহত।

আমিরকে আগলে রাখতে গিয়ে মা নিজের শরীরে নিলেন সমস্ত শেল-টুকরো। শহীদ হলেন মা ফাতিমা ও বাবা ইসমাইল—পেছনে রেখে গেলেন চারজন অসহায় এতিম।

আমির ও তার তিন ভাই-বোন বিস্ফোরণ থেকে বেঁচে গেছে। কিন্তু বেঁচে উঠতে পারেনি হারানোর সেই দুঃসহ শূন্যতা থেকে।

ইসমাইল আর ফাতিমা শীতল হাওয়ার খোঁজ করেছিলেন—কিন্তু তাঁদের কপালে জুটেছিল আগুনঝড়ে মৃত্যু।

প্রায় দুই বছর ধরে একই শোক, একই কান্না দেখে দেখে পৃথিবী হয়তো ক্লান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু গাজার শোক ফুরায় না।

মাবোমধ্যে আমিও আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। আর লিখতে ইচ্ছে করে না। ফিলিস্তিন জার্নাল লিখতে শুরু করেছিলাম মার্চ থেকে। এরপর গাজার প্রতিটি অলিগলি, প্রতিটি মুখ

ও কান্নার অংশ হয়ে গেছি। বের হতেও চাই না এই কান্নার আঁচল ছেড়ে। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় গাজা এখন আমার প্রাত্যহিক জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি—একদিন আমিও হাসব। ওদের সূর্যোঁঠা নতুন ভোরে, স্বাধীন জলপাই বনে ডানা মেলে উড়ে যাওয়া পাখিদের সঙ্গে।



যুদ্ধ আমাকে নতুন করে গড়েছে

যুদ্ধ শুরুর আগে আমি ভাবতাম, আমি একজন ভালো মানুষ। মনে করতাম—আমি আল্লাহকে ভয় করি, আমার আমল মোটামুটি ভালোই, সম্ভ্রষ্ট থাকার মতো।

কিন্তু যুদ্ধ এলে বুঝতে পারলাম—মানুষের ভেতরে এমন কিছু মহৎ গুণ আছে, যা কখনোই আমি অর্জন করতে পারতাম না, যদি যুদ্ধের বেদনা আমায় না ছুঁত।

আল্লাহকে আগে দূর থেকে চিনতাম। এখন খুব কাছ থেকে অনুভব করতে পারি। মনে হয়, আমি তাঁর যত্নে বেঁচে আছি। প্রচণ্ড ভয় পেলে তিনি আমার ভয় দূর করে দেন। যেন অদৃশ্য থেকে বলেন—

“আমি আছি তোমার সাথে।”

নিমিষেই ভেতরের সমস্ত ভীতি মিলিয়ে যায়, হৃদয় ভরে যায় প্রশান্তিতে। মৃত্যুকেও এখন মনে হয় কেবল আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার দরজা—এক চিরস্থায়ী আশ্রয়ের পথ।

আজ প্রতিটি ছোট ভুলেও ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠি। রান্নাঘরে হাত সামান্য ছ্যাঁকা খেলে মনে হয়, আল্লাহ বলছেন—

“রুবাব, সাবধান হও। এই ক্ষুদ্র আগুনের জ্বালা যদি সহ্য করতে না পারো, তবে আখিরাতের আগুন কেমন হবে?”

আগে এসব সাধারণ ঘটনা ভাবতাম। এখন বুঝি—এগুলো আসলে আল্লাহর আদরের টোকা, যেন মায়ের ভালোবাসার শাসন।

হ্যাঁ, সত্যিই যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে তিনি তোমাকেও ভালোবাসবেন। তিনি হয়ে যাবেন তোমার একমাত্র ভরসা, একমাত্র সঙ্গী। তখন আর একাকীত্ব বলে কিছু থাকবে না।

যুদ্ধ আমাকে ভেঙে দেয়নি—বরং নতুন করে গড়ে তুলেছে। আজ আমি যে ‘রুবাব’ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, তার পেছনে রয়েছে সেই দুঃখ, সেই পরীক্ষা, যা আমাকে আল্লাহর ভালোবাসায় সিক্ত করেছে।